ছোটগল্প

বছর দশ পর

সুজয় চক্রবর্তী

ঝিনুককে দরজা বন্ধ করতে দেখেই বুকের ভিতরটা ছ্যাঁক করে উঠল শুভেন্দুবাবুর। রাগের মাথায় মানুষ কখন যে কী করে বসে!

– বড় বউমা, দরজা খোলো। দরজা খোলো, মা। এমন ছেলেমানুষি কোরো না।

সজোরে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন শুভেন্দুবাবু। দাদুকে ওভাবে দরজা ধাক্কাতে দেখে ভয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে তপাই। শুভেন্দুর তিন বছরের নাতি। স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না এখনও।

– মা দলজা খুলতে না কেন দাদান্?

– তুমি একবার ডাকো দাদুভাই, মা ঠিক দরজা খুলবে।

ছোট্ট দু'টো হাত দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল তপাই।

– মা, দলজা খোলো। মা, দলজা খোলো।

মা দরজা খুলছে না দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

দু'হাত দূরেই সোফায় বসে আছে কমল। না শোনার ভান করে মোবাইলে গেম খেলে চলেছে।

নাতিকে কোলে তোলার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন শুভেন্দুবাবু। তার কান্না থামছে না কিছুতেই।

সদর দরজা ভেজানোই ছিল। মুদির দোকানের মাসকাবারি জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকল সবিতা। কাজের মেয়ে। তপাইকে ওভাবে কাঁদতে দেখে একপ্রকার জোর করেই কোলে তুলে নিল তাকে। কিন্তু থামল তো না-ই, তপাইয়ের কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

ওদিকে ঘর বন্ধ করে ঝিনুক সমানে বালিশে মুখ গুঁজে শুধু কেঁদে চলেছে। শেষে কিনা গায়ে হাত দিল কমল! কী হবে এই তাচ্ছিল্যের জীবনটা রেখে! জীবনটা শেষ করে দিতে হাতের কাছে সবকিছুই মজুত। বদ্ধ ঘরে কেউ বাধাও দেবে না! কিন্তু দরজার বাইরে শুধু তার জন্যই এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে তপাই – তারই রক্ত, মাংস দিয়ে গড়া এক অবোধ শিশু। সে চলে গেলে তপাইকে কোলেপিঠে করে কে মানুষ করবে? নাড়ি ছিন্ন করে তাকে যে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিল সে-ই। দায় তো তাই তারই! কেন না এক অকালকুষ্মাণ্ড যদি হয় তার জন্মদাতা পিতা, তার তো প্রতি পদে পদে বিপদ! হঠাৎ ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চোখ পড়ল ঝিনুকের।

আয়নার ঝিনুক যেন তাকে বলছে, 'দরজা খোলো ঝিনুক। তপাই কাঁদছে।'

দরজা খুলল ঝিনুক। তপাইকে সবিতার কোল থেকে নিজের কোলে নিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল সে। শুভেন্দুবাবু তার পিঠে হাত রাখলেন।

বসার ঘরে সোফার উপরে মাথা নীচু করে তখনও বসে আছে কমল। হাতে মোবাইল। ঝিনুককে বেরোতে দেখে একবার তাকালও। শুভেন্দুবাবু কমলের দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'ছি! বড় খোকা, ছি! তোকে যে কী বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

ঘাড় নাড়তে নাড়তে তিনি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। মাথা তুলে বাবার চলে যাওয়ার দিকে তাকাল কমল। তারপর বাইকের চাবিটা নিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল।

এই গম্ভীর পরিবেশে সবিতা রান্নাঘরে যাওয়ার সাহসও পাচ্ছেন না। এদিকে বেলা বয়ে যাচ্ছে।

ঝিনুক এখন চোখের জল মুছে তপাইকে স্নান করানোর তোড়জোড় করছে। মুখে কোনও কথা নেই তার। আজ দিনটা অন্যরকম। দিন পনেরো আগেই সেটা হতে পারত। ঝিনুক চায়নি বলেই সময় দিয়েছিল কমলকে। যাতে আর কোনও দিনই সে বর্ণালীর ছায়া না মাড়ায়। গত রাতেও তো এই নিয়ে একচোট হয়ে গিয়েছে। আর আজ সকালে বর্ণালীর ফোনটা আসার পরেই এই গণ্ডগোল।

(২)

– কে এই বর্ণালী? রজতদা?

সম্পর্ক উর্বর হলে পরও কখন আপন হয়ে যায়। রজতকে দাদা বলেই ডাকে ঝিনুক। রজত কমলের কলিগ। নিজের বোনের মতো ভালোবাসে ঝিনুককে।

– বর্ণালী আমাদের সেকশনে নতুন জয়েন করেছে। মেয়েটি এমনি মিশুকে। আনম্যারেড। বাবার একটাই মেয়ে। বাড়ির অবস্থা ভালো।

– কিন্তু কীভাবে ব্যাপারটা ...

– ওরা প্রায়ই অফিস শেষে একসঙ্গে ঘুরতে বেরোয়, এ রকম কানাঘুষো শুনেছি। তবে সেদিন যেটা ঘটেছে ... আর বসে থাকতে পারলাম না, তাই ছুটে এলাম।

– কী এমন ঘটল রজতদা...

– আমাদের স্টাফ পুলককে তো তুমি চেনো?

– হ্যাঁ, একবার দেখেওছি রাতুল চৌধুরীর মেয়ের বিয়েতে।

– সেদিন প্রায় সবাই-ই ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ছিল শুধু কমল, বর্ণালী, গ্রুপ ডি স্টাফ দু'জন আর পুলক। পুলকের মুখের কথায় আমি বিশ্বাস করিনি। যখন মোবাইলে সেই ছবি দেখালো, আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কমল কিনা বর্ণালীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, আর বর্ণালী বিলি কাটছে মাথায়! ... জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে শুনতে। কিন্তু মনে হল তোমাকে ঘটনাটা জানানো দরকার। এখনও সময় আছে, কমলকে ও পথ থেকে সরাও।

রাতে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে যে দু'একটা কথা হয়েছিল ঝিনুক আর কমলের মধ্যে, তা এইরকম ঃ

– বর্ণালী কে?

– রজত এসেছিল না?

– আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি।

– ওই তো বললাম। রজত এসছিল নিশ্চয়! ওই-ই তো সব বলে গিয়েছে। আবার আমাকে জিজ্ঞাসা কেন, বর্ণালী কে?

– ওর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

– আর পাঁচটা কলিগের সঙ্গে যেমন ...

– বাজে কথা রাখো। আমি কী বলতে চাইছি, আশা করি বুঝতে পারছ?

– কী বলতে চাইছ?

– স্বাদ বদল করছ?

– আমার ঘুম পাচ্ছে। এই রাত-দুপুরে চেল্লামেল্লি করতে ভালো লাগছে না।

– তাই! আচ্ছা, আমাদের কি প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল?

– আঃ, একটু ঘুমোতে দেবে?

– ঘুম? আমার ঘুম কেড়ে নিয়ে তুমি ঘুমোবে?

– চিল্লিও না। পাশের ঘরে বাবা আছে। তপাই জেগে উঠবে।

– বাঃ, কত ভাবো তুমি! কত ভাবো! এই ভাবনাটাই আগে হয়নি কেন? আমার কথা ভেবেছিলে? ভাবোনি। ... যাক, একটা কথা বলে রাখলাম, দ্বিতীয়বার যেন বর্ণালীকে নিয়ে তোমার নামে কোনও কথা না শুনি।

(৩)

সেই রাতের পর থেকে বর্ণালীর কোনও নামগন্ধ শোনা যায়নি কমলদের বাড়িতে। অনেকদিন।

কিন্তু আজ সকালে একটা আন্নোন নম্বর থেকে ফোন এসছিল কমলের মোবাইলে। কমল তখন টয়লেটে।

– হ্যালো কে?

– আমি বর্ণালী বলছি। কমলদা নেই?

– বর্ণালী? না, এটা রং নাম্বার। ফোনটা কেটে দিয়েছিল ঝিনুক। এর ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আবার ফোন এসছিল। সেম নাম্বার। ফোনটা ধরে চুপ করেছিল ঝিনুক।

– হ্যালো, ফোনটা কাটছেন কেন, এটা কমলদারই নাম্বার।

– হ্যাঁ, কমলদারই নাম্বার। কী দরকার বলো।

– সেটা কমলদাকেই বলব।

মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গিয়েছিল ঝিনুকের। আর সামলাতে পারেনি।

– বেহায়া কোথাকার! আর কোনও দিনও যদি তুমি এই নাম্বারে ফোন করেছ ... ফোনটা কেটে দেয় ঝিনুক।

এরমধ্যেই কখন যে কমল তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা টের পায়নি সে। ঝিনুকের হাত থেকে মোবাইলটা একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়ে একটা চড়

সবিতা রান্নাঘরে। সব কিছু আন্দাজ করে ঝিনুককে আর ঘাঁটায়নি সে। ঝিনুক এখন বেডরুমে ঠায় বসে। এ ঘটনা কার সঙ্গে শেয়ার করবে ঝিনুক? মা-র সঙ্গে? মা-র বয়স হয়েছে। চিন্তা করবে। তবে কাকে বলা যায়, যাতে একটু হলেও হালকা হতে পারে ঝিনুক। কেয়াকে কি ফোন করা যায়